

# প্রকৃত শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হবে

শিক্ষা ব্যবস্থা

হায়দার আকবর খান রনো

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একধরনের নৈরাজ্য চলছে। নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের কারণে। শিক্ষা এখন বাজারি বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যে যত টাকা দিতে পারবে, তার সন্তানরা তত ভালো শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী হবে। তবে সেই শিক্ষা সত্যিকার অর্থে ভালো শিক্ষা কি না, তা একটি বড় প্রশ্নও বটে। তাই ভালো শিক্ষা না বলে বলা উচিত ভালো ডিগ্রির সার্টিফিকেট পাবে, যার মূল্য আছে চাকরির বাজারে। শিক্ষার বেসরকারীকরণ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ যতীন সরকার বলেছেন, 'শিক্ষার প্রাইভেটাইজেশনের যে নীতি সরকারের সোৎসাহ সমর্থন পাচ্ছে, সে নীতি শুধু মহার্ঘ্য পণ্য বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সমস্ত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে পদদলিত করে শিক্ষাকে পুঁজি ও পুঁজিনির্ভর করে তুলেছে। "ডোনেশনের" নামে লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি করতে হয়, সে প্রতিষ্ঠান কি কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে?'

আসলে আমাদের দেশের শাসকশ্রেণি কখনোই শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত শিক্ষানীতির ঘোর সমালোচক ছিলেন। তিনি 'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমরা যে শিক্ষা আজকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদেরকে কেরানীগিরি অথবা কোন একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র।' তিনি আরও বলেন, 'এই শিক্ষা কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত।' তারপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তানি আমলে একই নীতি অনুসৃত হয়েছে আরও ছাত্রপাঠ্য। শিক্ষা সংকোচনের নীতির বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে ছাত্ররা ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতা-পরবর্তী সাড়ে চার দশকেও শাসকশ্রেণির শিক্ষাসংক্রান্ত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়নি। বরং তথাকথিত বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষাসহ সব সেবা খাতকে বাজারি পণ্যে পরিণত করা হয়েছে।

শাসকশ্রেণি চায় না যে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করুক। শোষিত শ্রেণিকে যত বেশি অশিক্ষিত রাখা যায়, ততই শাসক ও শোষকশ্রেণির জন্য সুবিধা। তাই শিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ কথা শুধু আমাদের দেশই নয়, পশ্চিমা উন্নত ধনবাদী দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উনিশ শতকে এক ইংরেজ বলেছিলেন, সে দেশে 'ভোটদানের অধিকার যত সহজে হয়েছে, লেখাপড়া শেখার সুযোগ তত সহজে হয়নি'। ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির বিখ্যাত চার্টার্ড স্কুল আন্দোলনের চাপের ফলে সেই দেশের শাসকেরা ১৮৭০ ও পরে ১৮৮৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার আইন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবু সেই আইন প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করে ব্রিটিশ লেখক এইচ জি ওয়েলস বলেছিলেন, 'নিম্নশ্রেণিকে নিম্নমানের কাজের উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়াই ছিল' আসল উদ্দেশ্য।

বস্তুত, শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিপতি শ্রেণি উপলব্ধি করেছিল যে 'তাদেরই স্বার্থে প্রয়োজন ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ, আধুনিক হিসাবরক্ষক ইত্যাদি। সে জন্য তারা সীমিত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু কখনো সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে তারা উৎসাহী ছিল না। বরং ফ্রান্স ও জার্মানি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে ইংল্যান্ডের চেয়ে এক শ বছর এগিয়ে ছিল, যদিও শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছিল ইংল্যান্ডেই প্রথম। ফ্রান্সে সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়টি ছিল সরাসরি ফরাসি বিপ্লবের ফল। অন্যদিকে জার্মানিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক



শিক্ষার বিষয়টির ক্ষেত্রে মার্টিন লুথারের প্রভাব কাজ করেছিল। প্রটেষ্ট্যান্ট রিফর্মেশনের যুগে দাবি ওঠে যে প্রজাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে।

ইংরেজরাই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করে। প্রশাসনিক ব্যয়ভার কমানোর জন্য তারা সীমিত আকারে উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন করে, যাতে কম খরচে প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ ভারতীয়দের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করা যায়। ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেতা ও বিশিষ্ট পণ্ডিত সৈয়দ শাহেদুল্লাহ 'জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক' শীর্ষক এক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে একদল ইংরেজের কিছুটা আগ্রহ আসে। তাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন এই জন্য যে তাতে কাঁচামাল উৎপাদনে সাহায্য হবে।'

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বাধা এসেছিল বাংলাদেশের জমিদারদের কাছ থেকে। ১৯২১ সালে সরকারের কাছে পেশ করা প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত রিস রিপোর্টে জমিদারদের আপত্তির কথা উল্লেখ আছে।

আপত্তির কারণগুলো ছিল এ রকম: চাষির ছেলের রোদ-বাতাস সহ্য করার ক্ষমতা চলে যাবে। ওই ছেলে পিতার কাজকে (চাষার কাজকে) ঘৃণা করতে শিখবে।

চাকরবাকর নষ্ট হয়ে যাবে। চোখ খুলে যাবে, দারিদ্র্য বেশি করে উপলব্ধি করবে এবং তা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম শুরু করবে।

চাষি যদি পড়তে আরম্ভ করে ও ভাবতে শুরু করে, তাহলে নীতিহীন প্রচারকদের পাল্লায় পড়বে। বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ প্রলেতারিয়েতকে যুক্ত করা বাস্তবিকই নির্বন্ধিত।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ এরপর আরও দেখিয়েছেন যে জমিদারদের প্রভাবের কারণেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা নানা অছিলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বিরোধিতা করেছেন। এখন যুগ পাল্টেছে। এখন কেউ সরাসরি বিরোধিতা করছে না। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি খুব বেশি বদলায়নি।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও শিক্ষকদের কম বেতন, শিক্ষাসামগ্রীর অভাব সরকারের অমনোযোগিতার প্রমাণ। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শ্রেণিবৈষম্য দেখা যাচ্ছে। মোটা দাগে তিন ধরনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় দেখা যাচ্ছে। সাধারণ বিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় (এ লেভেল, ও লেভেল ইত্যাদি) এবং মাদ্রাসা। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অনেকটি এনজিওর হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকার নিশ্চিত হয়ে বসে আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬ শতাংশ মাত্র। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করণ অবস্থার বিপরীতে আছে ঢাকার অতি উচ্চবিত্তের সন্তানদের জন্য বিলাসবহুল বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঢাকায় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যার ভর্তি ফি ১০ লাখ টাকার ওপরে, বার্ষিক টিউশন ফি আরও বেশি।

এরশাদবিরোধী গণ-আন্দোলনের সময় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য যে ১০ দফা দাবি উত্থাপন করেছিল, তার একটি দফায় বলা হয়েছে, 'শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন, গ্রাম ও শহরের সকল বৈষম্য (ক্যাডেট কলেজ, কিন্ডারগার্টেন, রেসিডেনশিয়াল, মডেল স্কুল, টিউটোরিয়াল হোম, মাদ্রাসা ইত্যাদি) দূর করে সারা দেশে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।' ছাত্রদের এই দাবির প্রতি সেদিন দুটি বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থন দিলেও পরে তারা ক্ষমতায় গিয়ে এই দাবির কথা ভুলে গেছে।

সম্প্রতি কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে এমএর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কওমি মাদ্রাসা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সরকারি ঘোষণায় কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সেখানে যারা লেখাপড়া করে, তারা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। মহান শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে স্বতন্ত্র মাদ্রাসাশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'আযাদ পাকিস্তানে ইহাদের (মাদ্রাসার) অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন, বরং হাস্যকর এবং লজ্জাজনকও বটে। পৃথিবীর কোন দেশে সরকার একাধিক শিক্ষাগ্রন্থী মঞ্জুর করে না।'

সরকারের দায়িত্ব সব রকম শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। যত দিন তা না হচ্ছে, তত দিন অন্ততপক্ষে সব রকম মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় মাদ্রাসায় পড়ে যে গরিব ছেলেমেয়েরা, তাদের প্রতি অবিচার করা হবে।

উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি নৈরাজ্য। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ভারতের শিক্ষাবিদ ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বিজেন্দ্র শর্মা বলেছেন, 'করপোরেট সেক্টর ট্রিলিয়ন ডলারের এক শিল্পক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে' আর সেটা হলো 'পরিষেবারুপী শিক্ষার ক্ষেত্র'।

বস্তুত, শিক্ষার আসল লক্ষ্যটাই হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনুষ্যত্বের বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই তিনি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

দার্শনিক হেগেল বলেছেন, 'সুশিক্ষিত মানুষ বলতে আমরা তাদেরই বোঝাই, যারা অপূর্ণ যা করে সেই সব কাজই করতে পারেন।' কথাটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে কার্ল মার্ক্স তাঁর ক্যাপিটাল (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে হেগেলের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা, যা আলো হয়ে জ্বলে, যার নিজের মধ্যে আলো থাকে এবং যা অন্যকে আলোকিত করে।'

সেই শিক্ষার জন্য আমাদের এখন সংগ্রাম করতে হবে। সর্বস্তরের ছাত্র, শিক্ষক ও প্রগতিশীল মানুষ সেই সংগ্রাম গড়ে তুলবেন বলে আশা রাখি।

● হায়দার আকবর খান রনো: রাজনৈতিক বিশ্লেষক। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।